সমকাল

তারিখ ··09 ·MAY··2016·· ···
পৃষ্ঠা ··· ৯ ··· কলাম··৩ ··· ······

শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত যেভাবে রচিত হয়

কুদরাত-এ-খুদা কমিশন | আলী আসগর

পদার্থবিদ ও সাবেক অধ্যাপক

শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা জীবনে অনেক ধরনের দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপনা, গবেষণা, জনশিক্ষা পরিচালনা, প্রশাসনিক কাজ, ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা– এসবই ছিল তার মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। তার প্রতিভার ছাপ বহু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিন্তু কুদরাত-এ-খুদার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে সমস্ত অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় তার গভীর অনুরাগ এবং দেশের প্রতি তার ভালোবাসার সার্থক ও সমন্বিত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনের সভাপতিরূপে তার দায়িত্ব পালনে। আমাদের দেশে শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্যে বেশ অনেকবার কমিশন গঠিত হয়েছে; স্বাধীনতা অর্জনের আগে ও পরে। কিন্তু কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের পটভূমি ছিল ব্যাপক। এর গুরুত্ব ছিল অপার। বহু দিক থেকে এই কমিশন ছিল বিশিষ্ট ও অনন্য।

এই খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার জন্ম ১৯০০ সালের ১ ডিসেম্বর। ১৯৭৭ সালের ৩ নভেম্বর ৭৬ বছরে তিনি মারা যান। ড. কুদরাত-এ-খুদা স্টেরিও রসায়নে গবেষণা দিয়ে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। পরবর্তীকালে তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, লবণ, কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত গবেষণামূলক জার্নালে তার রচিত প্রায় ১০২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই আমাদের কাছে সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি নতুন দেশ– বংলাদেশ। ভৌগোলিক ঠিকানা ও ভৌত পরিবেশে নতুন নয়; কিন্তু প্রেরণা, মূল্যবোধ, প্রত্যাশা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও দেশপ্রেমের উপলব্ধিতে রচিত সংবিধানের নীতিমালায় বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল তাতে। কিন্তু এই লক্ষ্য ও স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণে যা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা স্বভাবতই মানুষ– জ্ঞানী মানুষ, দক্ষ মানুষ, সৎ মানুষ। প্রেরণাপ্রাপ্ত, সৃজনশীল, পরিশ্রমী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সচেতন, দেশপ্রেমিক মানুষ।

এসব গুণসম্পন্ন মানুষ পেতে হলে চাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিক কোনো না কোনোভাবে প্রতিপালিত হওয়ার কথা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। একটি জাতিকে সঞ্জীবিত ও নতুনভাবে সৃষ্টি করার একমাত্র পথ হলো যথার্থ শিক্ষার মধ্য দিয়ে তরুণদের দক্ষতা, নৈপুণ্য ও প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো। শিক্ষার ভেতর দিয়েই মাত্র একজন তরুণ পশ্চাৎপদতা, জড়তা ও কুসংস্কার কাটিয়ে হয়ে উঠতে পারে সমকালীন ও আধুনিক। তার কর্মধারা ও পেশাকে বদলাতে পারে। নতুন উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করে রূপান্তর ঘটাতে পারে অর্থনীতিতে। অর্জন করতে পারে নতুন উপলব্ধি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করেই এ উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে।

এসব কথা বিশেষভাবে সত্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের এই যুগে। প্রাকৃতিক সম্পদের দৈন্যের চেয়েও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা অনেক বড় অন্তরায় এ অগ্রগতির পথে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পশ্চাৎপদ দেশগুলোর মূল পার্থক্য শিক্ষাব্যবস্থায়। সম্পদের ব্যবধানের চেয়েও বড় জ্ঞানের ব্যবধান। নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের অক্ষমতা অনেক বেশি মারাত্মক আমাদের জন্য। কারণ সম্পদের ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে দূর হতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের মধ্য দিয়ে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবধান সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েই মাত্র এই পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

সম্পদের অভাব যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সৃষ্ট, সেখানে তবু সান্ত্বনা থাকে যে, এর জন্য আমরা দায়ী নই। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেরা সৃষ্টি করতে পারি না। কিন্তু শিক্ষালাভ ও জ্ঞানের জগতে অগ্রগতি একটি জাতির সচেতন সাধনার ফসল। এ ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার জন্য আমাদের দায়িত্ব এড়ানোর অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে যে, চিন্তার জগতে যে অগ্রযাত্রা, সেখানে ভিক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো জাতির যা কিছু স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তার প্রতিফলন তাই থাকতে হবে এর শিক্ষা পরিকল্পনায় এবং তা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। এই শিক্ষা পরিকল্পনা এক অর্থে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-চিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমরা যদি সভ্যতার উষালগ্নেও চলে যাই সেখানে দেখতে পাব, প্লেটো তার 'রিপাবলিক' গ্রন্থে শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষা দর্শনের কথা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন।

আগের শিক্ষা ভাবনা ছিল স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বিশেষ সমাজের বিশেষ এক সময়ে শিক্ষা প্রদানের কথাই শুধু ভাবা হতো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনা সেদিক থেকে অত্যন্ত গতিশীল। আগামী ১০ বা ২০ বছর পরে জ্ঞানের দিগন্ত কতদূর বিস্তৃত হবে? নতুন কী সব যন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে? সেই উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে অংশ নিতে কি প্রস্তুতি প্রয়োজন? অথবা উদ্ভাবিত নতুন কৌশল ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার জন্য কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের? এসব প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। শিক্ষা পরিকল্পনা তাই অত্যন্ত সৃজনশীল এক কর্ম। এখানে দূরদৃষ্টি চাই, কল্পনাশক্তি চাই, সংস্কারমুক্ত উদার ভাবনা চাই, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা চাই।

তাই নতুন বাংলাদেশে সমস্ত মানুষের জন্য উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে শিক্ষা কমিশনের গুরুত্ব ছিল তাই অপরিসীম। শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্মশক্তিতে উদ্দীপিত করার এক মহৎ লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই। সেই বছরেই ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিশনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি কমিশনের কাছে শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনের গভীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

> কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করা হয় যে, এর সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই রিপোর্ট বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ মেলেনি, প্রত্যাশাকে যেন স্তব্ধ করেছিল

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশ, বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ অথচ উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদাবোধের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত সমগ্র জাতি। শিক্ষা কমিশনের ওপর অর্পিত হয়েছিল গভীর এক দায়িত্ব। দায়িত্বটি ছিল জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ ও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের হাতিয়াররূপে শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিকল্পনা করা। কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের অনেক বৈশিষ্ট্য– একে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গুরুত্ব ও বিশেষত্ব দিয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি অনন্য এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সমস্যা ও প্রত্যাশার। এই প্রথম একটি শিক্ষা কমিশন শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। গতানুগতিক ধারায় কিছু পরিবর্তন শুধু নয়; শুধু শিক্ষা সংস্কার নয়; সত্যিকার অর্থে রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজনেও নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে সব মানুষের মতপ্রকাশ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখার অধিকার মানুষ চেয়েছে। উদ্বুদ্ধ হয়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করতে। মানুষ চেয়েছে শোষণহীন নতুন সমাজ। সেখানে মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও চেতনা লাভ করেছিল; যে মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ও স্বপ্ন দেখেছিল, তা লিপিবদ্ধ হয় সংবিধানে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয় সংবিধানে। সংবিধানে উল্লিখিত নীতিগুলো যাতে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এমন একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল শিক্ষা পরিকল্পনায়। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের শুরুতেই শিক্ষার এই লক্ষ্যগুলো উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত– সব শ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ ও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের হাতিয়াররূপে শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে আস্থা স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাকে এমন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা প্রকৃত অর্থেই দুঃসাহসিক ও অভিনব এক কাজ ছিল।

বস্তুত স্বাধীনতার পর শিক্ষা কমিশন গঠন করা ছিল দেশের মঙ্গলচিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৃত্য। বাস্তব, প্রগতিশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ। প্রায় চারশ'জন সদস্যের তিরিশটি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটিতে দেশের বহু শিক্ষাবিদ অংশ নেন। সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে অবদান রাখার সুযোগ পান। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা যাতে জনসাধারণ ও নানা শিক্ষাবিদের ধারণা এবং মতামতের প্রতিফলন লাভ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করা হয় যে, এর সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই রিপোর্ট বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ মেলেনি। অর্থনৈতিক সংকট, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব এবং সর্বোপরি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, স্বাধীনতার সমস্ত প্রত্যাশাকে যেন স্তব্ধ করেছিল। সংবিধানের যে মূল নীতিমালা ও আদর্শকে ভিত্তি করে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট নির্মিত হয়েছিল সেখানেই নেমে এলো কালো ছায়া। শিক্ষার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও অনুপ্রেরণা জাতি এই দীর্ঘদিন পরেও আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি অথবা প্রত্যাশিত অর্থ বিনিয়োগ।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হলেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কুদরাত-এ-খুদা রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে, অগ্রগতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণের যে অঙ্গীকার এতে ছিল, তার সত্যতা যাচাই করা যেত প্রত্যক্ষভাবে। কমিশনের রিপোর্টের আশাবাদ ও অঙ্গীকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভের সে সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সেই রিপোর্ট যে বাস্তবায়িত হয়নি এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছে তা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে– এই রিপোর্টটির নির্দেশনাগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেশের জন্য। ভবিষ্যতের শিক্ষা পরিকল্পনায় এই রিপোর্টের সবকিছু না হোক, এর বিপুল অংশ আমাদের কাজে লাগবে।

কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে আমরা অতীতের একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখতে পাই। স্বভাবতই প্রায় তিন যুগ পরে সেই পরিকল্পনা বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য হবে না অপরিবর্তিতরূপে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতার ছাপ এতে রয়েছে, যে স্বপ্ন ও প্রত্যয় এতে বিধৃত হয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে, তা গভীর মূল্যের, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানের যে নিরতিশয় সমস্যা তার সমাধান খুঁজতে ও নতুন করে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এই রিপোর্টকে গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ ও অবধারণ করতে হবে।